ইতিহাস সমিতি পত্রিকা, সংখ্যা ৪২, ১৪৩১/২০২৪, ১২১-১৩৪
DOI: https://doi.org/10.59815/isp.vol4208

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ও মুক্তি আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে তাঁর ঢাকা আগমন

ড. মিলটন কুমার দেব
অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Abstract: Throughout his life Netaji Subhas Chandra Bose was guided by the ideals of Nationalism and secularism. These ideals were fround true expression in his immense political actions. Netaji is one of the legendary figures in our sub-continental history. Besides he has a special relevence for Dhaka. He has long fed into the Bengali notions of pride as well as neglect in indepenpent India. Netaji visited Dhaka for five times, first in 1924 and last in 1940 after he had resigned as the Congress president. His very last public meeting in undivided India was held right here in Dhaka on May 20, 1940, under the aegis of the Bengal Political Conference, where he boldly advocated self-rule for India. Netaji rightly felt British capitalist's wave rapidly building infrastructure in England to benefit themselves as the expense of the masses of Bengal. This paper analyses the Netaji's deep touch with Dhaka and he could not be away from it for too long, if ever. We draw our inspiration from Netaji whose ideals were inspired by the real life experiences of ordinary people.

Key Words: Netaji, Independence, Indian National Army, Congress

ভূমিকা

বাংলা তথা অবিভক্ত ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে যেসব মহান ব্যক্তি নিজেদের সর্বস্ব আত্মাহুতি দিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু একটি নক্ষত্রের মতো। বাংলার চিরায়ত অধ্যাত্ম-সাধনার বীজমন্ত্র অন্তরে ধারণ করে আত্মশক্তিনির্ভর কার্যধারায় সমগ্র দেশকে জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন তিনি। দেশজ আত্মার পূর্ণ প্রতিধ্বনিস্বরূপ 'জাতীয়-জাগরণের সার্থক ঋত্বিক' রূপে তাঁর অনন্য সত্তা চিরমান্য। তিনি একজন আপোষহীন চিরবিপ্লবী ও বীরযোদ্ধা। তাঁর রাজনৈতিক মতাদর্শই ছিল– স্বাধীনতা কারও দয়ায় পাওয়া যায় না। স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিতে হয়, অন্তহীন সংগ্রামের মাধ্যমে জয় করে নিতে হয়।

দেশমাতৃকার স্বাধীনতার জন্য তিনি নিজের জীবন তুচ্ছ করে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত ছুটে বেরিয়েছিলেন। পাশাপাশি, ঐক্যবদ্ধ বাংলার মুক্তির জন্য তিনি গড়ে তোলেন একটি সাংগঠনিক কাঠামো। নেতাজির এই সংগঠন ছিল সংগ্রামমুখর ও

সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী। নেতাজির রাজনৈতিক আদর্শ, আচরণ ও কার্যক্রম ছিল নাটকীয় এবং দুঃসাহসিক ঘটনাপ্রবাহ দ্বারা পরিপূর্ণ। তাই অনেকের ধারণা, গান্ধীকে 'ভারতীয় জাতীয় জাগরণের জনক' বলা হলে সুভাষ বসুকে 'ভারতীয় বিপ্লবের জনক' বলাই সঠিক। এমনকি কেউ কেউ মনে করেন যে, সুভাষকে বিশ শতকের ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ ভারতীয় খ্যাতিমান পুরুষ বললেও সম্ভবত অত্যুক্তি হবে না।[১]

জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের কাছেই তিনি ছিলেন প্রিয়পাত্র– হয়ে ওঠেন নেতাজি। অবিভক্ত বাংলার ঢাকাসহ সর্বত্রই তাঁর জনপ্রিয়তা পৌঁছেছিল তুঙ্গে। তাই নানা সময়ে তিনি ছুটে এসেছেন ঢাকায়। তাঁর বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবনের ঘটনাপ্রবাহে ঢাকা রয়েছে একটি বিশিষ্ট স্থানে। কারণ অখণ্ড ভারতে শেষ বক্তৃতায় তিনি জনসমক্ষে কথা বলেন এই ঢাকাতেই। তাই নেতাজি জীবনের ঢাকা অধ্যায়কে এই প্রবন্ধে তুলে ধরা হয়েছে।

সুভাষচন্দ্র বসু

সুভাষচন্দ্র বসুর জন্ম এক শিক্ষিত বাঙালি পরিবারে ২৩ জানুয়ারি ১৮৯৭ সালে। উড়িষ্যার (বর্তমান ওডিসা) কটকে। বাবার নাম জানকীনাথ বসু আর মা প্রভাবতী বসু। মা-বাবা উভয়েই ছিলেন বাংলার প্রখ্যাত কায়স্থ পরিবার বংশোদ্ভূত। মা-বাবার নবম সন্তান এবং ষষ্ঠ পুত্র হলেন সুভাষ। সুভাষের বাবা জানকীনাথ ছিলেন একজন জনদরদি ও নামজাদা আইনজীবী। একইসাথে সমাজ সচেতনতার জন্যও তাঁর প্রচুর খ্যাতি ছিল। উড়িষ্যাতে কটক পৌরসভার প্রথম নির্বাচিত চেয়ারম্যান হিসেবে তিনি ১৯০১ সালে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯০৫ সালে সরকারি কৌঁসুলি হিসেবে কটকে নিয়োজিত ছিলেন। পরে ১৯১২ সালে তিনি বাংলা বিধানসভার কাউন্সিল সদস্য হন এবং ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ হতে তাঁকে 'রায় বাহাদুর' উপাধিতে সম্মানিত করা হয়। ১৯৩০ সালে জাতীয়তাবাদী বন্দীদের প্রতি ব্রিটিশ সরকারের দমননীতির প্রতিবাদে তিনি এই উপাধি প্রত্যাখ্যান করেন।[২]

শিক্ষাজীবনের প্রথমদিকে সুভাষ ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করেন একটি ব্যাপ্টিস্ট মিশনারি স্কুলে। এখানে পড়ার সময় শিশু সুভাষ লক্ষ্য করেন যে, কিছু ভারতীয় অভিজাত পরিবারের সন্তানরা এই প্রতিষ্ঠানে পড়ার সুযোগ পেলেও তারা বৈষম্যের শিকার হয়, ইংরেজরা ভারতীয় শিশুদের ঘৃণার চোখে দেখে, ভারতীয় শিশুদের তারা মর্যাদা দিতে চায় না, ভালো ছাত্র হয়েও ভারতীয় ছেলেরা স্কলারশিপ পরীক্ষা দিতে পারে না। এসব বিভেদনীতি দেখে সুভাষের মনে ক্ষোভ জমা হলো। তাই তিনি ছাড়তে চাইলেন এই বিদ্যালয়। বাবাকে রাজি করিয়ে এবার সুভাষ ভর্তি হন র‍্যাভেনজ কলেজিয়েট স্কুলে।[৩] ১৯০৯ সালে সুভাষ যখন ৪র্থ শ্রেণীর ছাত্র তখন এই স্কুলে ভারতীয় পরিবেশে বাঙালিয়ানা খুঁজে পান। তাই মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা আরম্ভ করেন। এখানেই তিনি শিক্ষক হিসেবে পান বেনীমাধবকে। যিনি নৈতিক মূল্যবোধপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠার বিষয়ে জোর দিয়ে সুভাষের প্রিয় শিক্ষক হয়ে ওঠেন। ছাত্রাবস্থায়ই সুভাষ খুঁজে পান এক নতুন আলো। পড়ে ফেলেন স্বামী বিবেকানন্দের রচনাবলী। 'জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে

ঈশ্বর'–এই কথা প্রচার করে স্বামী বিবেকানন্দ মানবতাবাদী হিসেবে সর্বত্র বরণীয় হয়েছেন। 'ভুলিওনা নীচ জাতি, মুর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার ভাই'–বিবেকানন্দের এই উক্তি বালক সুভাষের মনে ঘটিয়ে দিল এক নীরব বিপ্লব। জাতি-ধর্ম-বর্ণ ভুলে মানুষকে ভালোবাসতে শিখলেন তিনি।[৪]

বাবার প্রবল ইচ্ছার কারণে তিনি ১৯২১ সালে ইংল্যান্ডে যান এবং সেখানে ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন শুরু করেন। এবছরই তিনি আইসিএস পরীক্ষায় অংশ নিয়ে মেধা তালিকায় চতুর্থ স্থান দখল করেন। উল্লেখ্য, সেসময়ে আইসিএস পরীক্ষার সিলেবাস এমনভাবে তৈরি করা হতো যেন কোনো ভারতীয় পরীক্ষার্থী সহজে পাশ করতে না পারে, তাছাড়া পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোও বসানো হতো ইংল্যান্ডে। কিন্তু অদম্য মেধাবী সুভাষ ঠিকই তাঁর মেধার পরিচয় দেন। অল্পদিন পরই তিনি আইসিএস চাকুরি ত্যাগ করেন। তাঁর লক্ষ্য হয় রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক দাসত্ব থেকে দেশের পরিত্রাণ। নিজের এই প্রবল ইচ্ছার কথা সুভাষ লিখে জানান তাঁর মাকে। আইসিএস ছেড়ে দেয়ার ঘটনায় তাঁর বাবা প্রথমে বিরাগভাজন হলেও পরে পুত্রের সাহসিকতায় গর্ববোধ করেছেন।[৫] ইংল্যান্ড থেকে ফিরে এসে সুভাষ রাজনীতিতে সক্রিয় হয়ে কংগ্রেসের সাথে কাজ করেন। রাজনীতিতে তিনি ছিলেন চিত্তরঞ্জন দাশের আদর্শের অনুসারী, যিনি 'দেশবন্ধু' নামে সমধিক পরিচিত। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে দেশবন্ধু গান্ধীর তুলনায় আরও বেশি তেজোদীপ্ত মনোভাব পোষণ করতেন। এই দেশবন্ধুর কাছেই সুভাষ রাজনীতির দীক্ষালাভ করেন। ১৯২১ সালে সক্রিয় রাজনীতি শুরুর পর অল্পসময়ের মধ্যেই নিজ কর্ম ও দক্ষতা গুণে তিনি উঠে আসেন পাদপ্রদীপের আলোয়।

কংগ্রেসের রাজনীতিতে থাকার সময় ১৯২৭ সালে সুভাষচন্দ্র বসু কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। রাজনীতি করতে গিয়ে তিনি বহুবার কারাবরণ করেন। ১৯৩৮ ও ১৯৩৯ সালে নেতাজি পরপর দুইবার কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। কিন্তু দেশমাতৃকার স্বাধীনতার পথে সশস্ত্র পথ অবলম্বনের কথা বলার ফলে গান্ধীসহ অন্যদের সাথে তাঁর মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়। এমতাবস্থায় ১৯৩৯ সালে তিনি কংগ্রেসের সভাপতি পদ থেকে পদত্যাগ করেন। এরপর তিনি 'ফরোয়ার্ড ব্লক' নামে দল গঠন করে বিপ্লবী শক্তিগুলোকে সুসংহত করার প্রয়াস চালান।

কারাভোগ থেকে মুক্তিলাভের পর তিনি কলকাতার বাসায় ফিরে আসেন, সেসময়ে তাঁর বাসায় সার্বক্ষণিক কঠোর প্রহরার ব্যবস্থা নেয়া হয়। কিন্তু এর মধ্যেই ব্রিটিশ প্রহরাকে তুচ্ছ করে সুভাষ ছদ্মবেশে বের হয়ে যান এবং স্বদেশ থেকে অন্তর্ধান হন। জানা যায়, তিনি প্রথমে আফগানিস্তান হয়ে রাশিয়া যান। আরও পরে যান জার্মানি। জার্মানিতে ১৯৪১ সালের নভেম্বরে তিনি 'ফ্রি ইন্ডিয়া সেন্টার' গঠন করেন। প্রকৃতপক্ষে তা ছিল ইউরোপে গঠিত ভারতের অস্থায়ী স্বাধীন সরকার। এরপর ভারতীয় জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর সাথে নিবিড় সংযোগ স্থাপিত হয় সুভাষের। এবার সুভাষের লক্ষ দক্ষিণ-পূর্ব

এশিয়া–জাপান। তিনি যখন জাপান আসেন তখন জাপানের প্রধানমন্ত্রী জেনারেল তোজো। সরকারি তরফে জার্মানিতে হিটলারের সাথে সুভাষের যেমন আলোচনা হয় তেমনি তোজোর সাথেও আলোচনা চলে। ১৯৪৩-এর জুন মাসে সুভাষ আসেন সিঙ্গাপুর। তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে সিঙ্গাপুরে আসেন রাসবিহারী বসু। রাসবিহারী ইতিমধ্যে জাপানে প্রবাসী ভারতীয়দের নিয়ে গঠন করেন 'ইন্ডিয়া ইন্ডিপেন্ডেন্স লিগ', এর প্রধান কেন্দ্র ছিল সিঙ্গাপুরে।[৬] এখানেই রাসবিহারী সুভাষকে নতুনভাবে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মিকে পুনরায় সংগঠিত করার দায়িত্ব দেন। ফলে ১৯৪৩-এর জুলাই মাসে সুভাষ ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মিকে পুনরায় সংগঠিত করেন। একই বছরের অক্টোবর মাসে সুভাষ 'অস্থায়ী আজাদ হিন্দ' সরকার গঠন করেন। এই সরকারের সদর দফতর স্থাপন করা হয় সিঙ্গাপুরে। নেতাজি 'আজাদ হিন্দ ফৌজ'-এর সিপাহ সালার বা প্রধান সেনাপতির পদ অলংকৃত করেন। ইতোমধ্যে নয়টি রাষ্ট্র আজাদ হিন্দ সরকারের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করেন। রাষ্ট্রগুলো হলো : জাপান, বার্মা, ক্রোয়েশিয়া, জার্মানি, ফিলিপাইন, ন্যাশনাল চায়না, মাঞ্চুরিয়া, ইতালি ও থাইল্যান্ড।[৭] উল্লেখ্য, সিঙ্গাপুরে ব্রিটিশরা হেরে গেলে নেতাজি ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের নতুন সম্ভাবনা দেখতে পান। এসময় আজাদ হিন্দ রেডিওতে দেওয়া এক ভাষণে নেতাজি বলেন :

> The fall of Singapore means the collapse of the British Empire, the end of the inquitions regime which it has symbolized and the dawn of a new era in Indian History. Through Indian's liberation Asia and the world will move forward towards the largest good of Human Emancipation.[৮]

পরবর্তীকালে ১৯৪৪ সালের জানুয়ারিতে নেতাজি তাঁর আজাদ হিন্দ ফৌজ ও অস্থায়ী সরকারের প্রধান কার্যালয় সিঙ্গাপুর থেকে রেঙ্গুনে স্থানান্তর করেন। আজাদ হিন্দ ফৌজের বাছাই করা সৈন্যদের নিয়ে গঠন করা হয় এই বাহিনীর গেরিলা অংশ 'সুভাষ ব্রিগেড'। সিদ্ধান্ত হয় এই ব্রিগেড জাপানি সৈন্যদের সাথে মূল রণক্ষেত্রে যুদ্ধ করবে।[৯] আজাদ হিন্দ ফৌজের তিনটি দল পাঠানো হয় ভারতের সীমান্ত ঘেঁষা আরাকান, ইম্ফল ও কোহিমা সেক্টরে।[১০]

প্রথম ঢাকায় আগমন ও সাধনা ঔষধালয় পরিদর্শন

ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের কাজে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু একাধিকবার ঢাকা এসেছেন। তাঁর বৈপ্লবিক রাজনৈতিক জীবনের একটা বড়ো অধ্যায় জুড়ে রয়েছে ঢাকা। ঢাকায় প্রথমবার নেতাজির আগমন ঘটে ১৯২৪ সালে। ঠিক আগের বছর ১৯২৩ সালে নেতাজি সর্বভারতীয় যুব কংগ্রেসের সভাপতি এবং একই সাথে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন।[১১] ফলে ১৯২৪ সালে তাঁর ঢাকা সফর ছিল ঐতিহাসিকভাবে খুব গুরুত্ববহ। ঢাকাবাসী তাঁকে বিপুল সমাদরে স্বাগত জানিয়েছিল।

১৯২৪ সালে নেতাজির প্রথম ঢাকা সফরের ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন আশরাফউদ্দিন আহমেদ চৌধুরী। আশরাফউদ্দিন ছিলেন নেতাজির ঘনিষ্ঠ এবং পরবর্তী

সময়ে ফরওয়ার্ড ব্লকের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য। ১৯২৪ সালের সফরে নেতাজি তৎকালীন ঢাকার নামকরা সাধনা ঔষধালয়ের প্রতিষ্ঠাতার কাছ থেকে একটি আমন্ত্রণ পান। এই ঔষধালয়ের প্রতিষ্ঠাতা, প্রখ্যাত আয়ুর্বেদশাস্ত্র বিশারদ ও শিক্ষাবিদ অধ্যক্ষ যোগেশচন্দ্র ঘোষ নিজে নেতাজিকে আমন্ত্রণ জানিয়ে ধন্য হন। এই আমন্ত্রণ রক্ষা করে নেতাজি সাধনা ঔষধালয় পরিদর্শন করেন, তিনি লিখেন,

> আমি ঢাকার সাধনা ঔষধালয় পরিদর্শন করিয়াছি। এবং তাহাদের ঔষধ সুসংরক্ষণ, প্রস্তুত প্রণালী ও সৌষ্টবযুক্ত কার্যসম্পাদন ব্যবস্থা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। সাধনার প্রস্তুত ঔষধাবলীর শাস্ত্রীয়তা ও অকৃত্রিমতা সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণরূপে নিঃসন্দেহ হইয়াছি। অধ্যক্ষ মহাশয়ের জনহিতৈষণার মনোভাবও বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। এই প্রতিষ্ঠানের কর্মপ্রচেষ্টাকে সমর্থন করিলে আয়ুর্বেদকেই সমর্থন করা হইবে। সত্যসত্যই আয়ুর্বেদানুসারি বলিয়া সাধনার প্রস্তুত ঔষধাবলীর ব্যবহারের দ্বারা যে কেবল রোগ আরোগ্যের পক্ষে বাঞ্ছিত লাভই হইবে তাহা নয় পরন্তু ঔষধগুলির এই প্রকার ফলপ্রসু শক্তি আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসকগণের জনপ্রিয়তাকেও বহুল পরিমাণে বর্ধিত করিবে। ঢাকার এই সর্বপ্রধান ঔষধালয়ের কর্তৃপক্ষ যেরূপ নিষ্ঠা ও সফলতার সহিত আয়ুর্বেদের সেবা করিতেছেন তাহাতে আমি তাহাদিগকে অভিনন্দিত না করিয়া পারিলাম না।[১২]

১৯২৪ সালে ঢাকা সফরের সময় নেতাজি ঢাকার বিপ্লবীদের সঙ্গেও সংযোগ রক্ষা করেন। ১৯২৪ সালে সুভাষ বসুর ঢাকা সফর ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের নজরে ছিল। কারণ তারা জানত যে, সুভাষের কর্মধারা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সক্রিয় আন্দোলনে সর্বদা নিয়োজিত। তাই সুভাষকে মোকাবিলা করার জন্য তাঁকে আটক করার প্রস্তুতি নেয়। ঢাকা সফরের পর ১৯২৪ সালের অক্টোবরে সুভাষকে আবার কলকাতাতে আটক করা হয়। সেই সময় সুভাষসহ মোট তেত্রিশজনকে আটক করে কলকাতাতেই বন্দি রাখা হয়। ঢাকা থেকে প্রকাশিত একটি সাপ্তাহিক পত্রিকায় এই খবর ছাপা হয়।[১৩] এই বন্দিদের মধ্যে সুভাষসহ সাতজনকে ১৯২৫ সালের জানুয়ারিতে বার্মার মান্দালার কারাগারে স্থানান্তর করা হয়।

নেতাজির ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের সেই স্বাধীনতা সংগ্রামের ঢেউ আছড়ে পড়েছিল পূর্ববঙ্গ তথা আজকের বাংলাদেশের বুকেও। সেই সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নিয়েছিল হাজার হাজার বাঙালি বিপ্লবী। অকাতরে বিলিয়েছিল নিজের প্রাণ, বুকের তাজা রক্ত। নেতাজির ঢাকা সফরের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মানুষের মধ্যে স্বাধীনতা অর্জনের পন্থা বুঝিয়ে দেওয়া। সেদিন সাধনা ঔষধালয় পরিদর্শন উপলক্ষে নেতাজি ঢাকায় আসলেও তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল জনসাধারণের মাঝে স্বাধীনতার স্বপ্ন ছড়িয়ে দেওয়া। স্বাধীনতা আদায়ের লক্ষ্যে কার কী করণীয় তা বুঝিয়ে দেওয়া। তাই সেই সফরে নেতাজির সঙ্গে ছিলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, কাজী নজরুল ইসলামের মতো ব্রিটিশ বিরোধী বাঘা বাঘা বিপ্লবী মহামানব।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নেতাজী

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের প্রধান বিদ্যাপীঠ, যা প্রাচ্যের অক্সফোর্ড নামে সমধিক পরিচিত। ১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠিত এই বিশ্ববিদ্যালয় শতবর্ষ অতিক্রম করেছে। ১৯২৭ সালে দীর্ঘ কারাভোগের পর মে মাসে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু কারামুক্ত হন। এই মুক্তির খবর ঢাকায় এসে পৌঁছালে নেতাজি ভক্তরা আলোড়িত হয়। কারাগার হতে দুই বছরের অধিককাল পরে মুক্ত হওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই নেতাজি ঢাকায় আসেন। বাংলার রাজনীতিতে তিনি তখন তারুণ্যের প্রতীক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনটি ছাত্রাবাসেই তিনি আমন্ত্রিত হন। তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনটি ছাত্রাবাস হলো মুসলিম হল (বর্তমানে সলিমুল্লাহ মুসলিম হল), ঢাকা হল (বর্তমান ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ হল) ও জগন্নাথ হল। প্রথমেই তিনি মুসলিম হলে যান এবং সেসময়ে হলের বিখ্যাত ডাইনিং রুমে কয়েকশ হিন্দু-মুসলিম ছাত্রের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতায় নেতাজি জাতির কল্যাণার্থে ভেদাভেদ ভুলে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। নেতাজির বক্তৃতা সম্পর্কে সেসময়ের মুসলিম হল সংসদের রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়ঃ Mr. Bose in a very fine way exshorted us all to sink our differences for the good of the country।[১৪]

নেতাজি সুভাষ বসুর বক্তৃতা মুসলিম হলের শিক্ষার্থীদের মধ্যে উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছিল। নেতাজি বক্তৃতায় বলেন :

> বাংলায় উচ্চশিক্ষিত মুসলমানের বর্তমানে অভাব নেই। মুসলিম হলের ছাত্রদের দেখে আশা জাগছে। আগামী দশ বছরের মধ্যে বহু উচ্চশিক্ষিত মুসলমান বেরিয়ে আসবেন। ইংরেজদের চলে যেতে হবে। এই দেশের শাসনভার বর্তাবে দুই সম্প্রদায়ের নেতাদের ওপর। শিক্ষার প্রসার ঘটায় দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে দূরত্ব থাকার কোনো যুক্তি নেই।[১৫]

জানা যায়, বক্তৃতা প্রদানের এই অনুষ্ঠানে ছাত্র নেতৃবর্গের মধ্য থেকে সৈয়দ আবদুল ওয়াহেদ, ওয়ালীউল্লাহ পাটোয়ারী, এ এফ এম আবদুল হক, আলী নূর প্রমুখ সুভাষচন্দ্রের অভ্যর্থনার বিষয়ে উদ্যোক্তার ভূমিকা পালন করেন। সুভাষচন্দ্রের বক্তৃতাদানের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হলের সে সময়কার ছাত্র আবুল ফজল, যিনি পরবর্তী সময়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। আবুল ফজল তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন :

> .. মান্দালয় জেল থেকে বেরিয়ে আসার পরই সুভাষচন্দ্র বসু একবার পূর্ববঙ্গ সফরে এসেছিলেন। ঢাকায় এলে সলিমউল্লাহ মুসলিম হল ইউনিয়নের পক্ষ থেকেও তাঁকে কিছু বলার জন্য করা হয়েছিল অনুরোধ। এ অনুরোধ তিনি রক্ষা করেছিলেন। কুষ্টিয়ার শামসুদ্দীন আহমদ সাহেবকে (অবিভক্ত বাংলার প্রাক্তন মন্ত্রী) সঙ্গে নিয়ে হলে এসে এক সভায় তিনি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। যতদূর মনে পড়ে, সে বক্তৃতার সূচনায় তিনি বলেছিলেন .... আমি আমার বন্ধু মুজাফ্‌ফর আহমদকে প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি হতে অনেক অনুরোধ উপরোধ করে ব্যর্থ হয়েছি, কোন প্রকারে তাঁকে শুধু সহ-সভাপতি হতেই রাজি করাতে পেরেছি। ... তখন সুভাষচন্দ্র ছিলেন প্রাদেশিক

> কংগ্রেসের সভাপতি আর অন্যতম সহসভাপতি ছিলেন মুজাফফর আহমদ। বলা বাহুল্য, তখনো সমাজতন্ত্রী আর সাম্যবাদীরা কংগ্রেস থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েননি।[১৬]

পূর্ববঙ্গ সফরের এই পর্বে নেতাজি ঢাকার করোনেশন পার্কে এক বিরাট জনসভায়ও বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতা শেষ করে রাত আটটার পর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলে যান; সেখানে ছাত্রদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। নেতাজির জগন্নাথ হলে গমন উপলক্ষে ঢাকার সংবাদপত্রে লেখা হয়,

> অতঃপর নেতৃদ্বয় (সুভাষ বসু ও মৌলভি শামসুদ্দীন আহম্মদ) জগন্নাথ হলে গমন করেন এবং তথায় সমবেত ইউনিভার্সিটির ছাত্রদের উদ্দেশ্য করিয়া এক বক্তৃতা প্রদান করেন। পরেরদিন প্রাতঃকালে তাঁহারা ন্যাশনাল মেডিক্যাল স্কুল ও অন্যান্য স্কুল পরিদর্শন করেন এবং শহরের বহু নেতা ও ভদ্র মহোদয়গণের সহিত কথাবার্তা বলেন। শ্রীযুক্ত বসুকে বিভিন্ন সঙ্ঘ ও স্কুল হইতে অভিনন্দন পত্র প্রদান করা হইয়াছে। তিনি তৎসম্প্রদায়ের অতি সুন্দর উত্তর প্রদান করিয়াছেন।[১৭]

ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাচনে

কংগ্রেস থেকে পদত্যাগের আগ পর্যন্ত যেকোনো নির্বাচনে কংগ্রেসের প্রার্থীকে বিজয়ী করার জন্য সুভাষ যথাসাধ্য প্রয়াস করেছেন। ১৯২৮ সালে ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনের সময় ঢাকাবাসীর প্রতি আবেদন জানান কংগ্রেসের প্রার্থীকে বিজয়ী করার জন্য। সেসময় বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি সুভাষচন্দ্র বসু ঢাকাবাসীর প্রতি যে আবেদন উপস্থাপন করেন তাতে লেখা ছিল :

> আজ সমগ্র দেশে এক দিকে আমলাতন্ত্রের সংঘবদ্ধ চেষ্টা জনসাধারণের মুক্তিপথ দুর্গম করিয়া তুলিতেছে, অপরদিকে ভারতের জাতীয় মুক্তিকামী কংগ্রেস, জাতির প্রবৃদ্ধ চেতনাকে সংহত করিয়া আমলাতন্ত্র সরকারের যাবতীয় প্রচেষ্টায় প্রতিরোধ করিতে দাঁড়াইয়াছে। এ বিরোধ ক্রমেই দেশের সর্বক্ষেত্রে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে। সেই সম্ভাবনাকে এড়াইয়া দেশবাসীর চলিবার উপায় নাই। বরং কংগ্রেস যাহাতে শক্তিসম্পন্ন হইয়া আমলাতন্ত্রের সর্ব্ববিধ প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও জাতীয় মুক্তি সম্ভব করিয়া তুলিতে পারে, দেশবাসীর তাহাই করা কর্তব্য।[১৮]

আবেদনে সুভাষ বসু আরও লেখেন : .... গতবারে আপনাদের ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটিতে সংখ্যায় অল্প হইয়াও কংগ্রেসের মনোনীত সদস্যগণ উল্লেখযোগ্য অনেক কাজ করিয়াছেন।[১৯]

এই আবেদনের শেষভাগে নেতাজি আসন্ন নির্বাচনে কংগ্রেস মনোনীত ব্যক্তিকে সমর্থন করে একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস দল এবং দেশের মর্যাদা রক্ষা ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের অসম্পূর্ণ কাজ সম্পন্ন করার জন্য ঢাকাবাসীর প্রতি নিবেদন করেন।

ঢাকার করোনেশন পার্কে

১৯২৮ সালে নেতাজি আবার ঢাকায় আসেন। এর আগে দুই বছর সাত মাসের কারাভোগ শেষে বিনা শর্তে নেতাজি বার্মা হতে কারামুক্ত হন। তাঁর কারামুক্তি উপলক্ষে ঢাকার স্থানীয় কংগ্রেস কমিটির উৎসাহে ঢাকাস্থ করোনেশন পার্কে এক বিরাট সভার আয়োজন করা হয়। নেতাজির মুক্তি উপলক্ষে আনন্দ প্রকাশ করে যোগেন্দ্রনাথ গুহ ঠাকুরতা, শ্রীশচন্দ্র চট্টোপ্যাধ্যায় প্রমুখ বক্তৃতা করেন। তাঁরা সবাই নেতাজির স্বাস্থ্যহানির জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন এবং এর জন্য আমলাতন্ত্র মূলক সরকারকে দায়ী করেন। সভায় উপস্থিত ঢাকার প্রথিতযশা চিকিৎসক ডাক্তার মোহিনীমোহন দাস বলেন :

> সুভাষবাবুর আরোগ্যর মাত্র একটি ঔষধ আছে এবং তাহা এই যে, দেশ সেবার নিমিত্ত সুভাষবাবু স্বীয় জীবন উৎসর্গ করিয়াছে, আজ যদি দেশের প্রত্যেক তরুণ ঐ ব্রত গ্রহণ করেন এবং সম্পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করিয়া প্রাণপণে দেশের সেবায় নিয়োজিত হন, তবেই সুভাষবাবুর ঔষধ মিলিবে।[২০]

এই সভায় সুভাষ বসুর মুক্তিতে ঢাকার আপামর জনমানুষের পক্ষ হতে বিপুল আনন্দ ব্যক্ত করে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। প্রস্তাবে সকলেই সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তার নিকট নেতাজির আরোগ্য লাভের জন্য প্রার্থনা করেন। ১৯২৮ সালের জানুয়ারিতে ঢাকা সফরের সময় বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি সুভাষচন্দ্র বসু ও মৌলভি শামসুদ্দিন আহম্মদ কংগ্রেসের কাজে ঢাকায় আসেন। এক বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার সময়ে স্থানীয় করোনেশন পার্কে এক মহাজনসভার আয়োজন হয়। খাজা আবদুল করিম সভায় সভাপতিত্ব করেন। অসহযোগ আন্দোলনের পরে ঢাকা শহরে এত বড় জনসভা আর হয়নি। সভার শুরুতে মৌলভি শামসুদ্দিন আহম্মদ ভাষণ দেয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালে চারপাশ হতে হর্ষধ্বনি শোনা যায়। তিনি হিন্দু মুসলিম সম্মিলন সম্পর্কে দীর্ঘ বক্তৃতা দেন। বক্তৃতায় উল্লেখ করা হয় :

> ... সাম্প্রদায়িক মিলন সম্পর্কে মাদ্রাজ কংগ্রেসে পরিগৃহীত নীতি নির্ধারণ অপেক্ষা অন্য কোন সুস্থ ব্যবস্থা হইতে পারে না। হিন্দু এবং মুসলমানের মধ্যে বিরোধ মিটানোর ক্ষমতা একমাত্র হিন্দু মুসলমানেরই। অন্য কোন জাতি বা কোন শক্তি কখনও এই বিরোধ মেটাতেই পারে না।[২১]

মৌলভি শামসুদ্দীন তাঁর দীর্ঘ ভাষণের শেষভাগে হিন্দু মুসলমান দুই সম্প্রদায়কেই বিদ্বেষ ভুলে প্রীতিময় বন্ধনে আবন্ধ হয়ে দেশ ও জাতির উন্নতিকল্পে কাজ করার অনুরোধ জানান।

এরপর নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ভাষণ দিতে দাঁড়ান। এসময় চারদিক হতে তুমুল আনন্দধ্বনি ওঠে। নেতাজি যে ভাষণ দেন, তাতে হিন্দু মুসলিম সম্প্রীতি, রয়াল কমিশন বয়কট, দেশের চলমান অবস্থা, বিলেতি পণ্য বর্জন এবং স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার প্রসঙ্গ তুলে ধরেন। তাঁর হৃদয়গ্রাহী সুদীর্ঘ ভাষণ উপস্থিত জনমানুষকে চমৎকৃত করে। নেতাজি তাঁর ভাষণে বলেন :

> দেশের এখন ভয়ানক দুর্দিন, এ সময় হিন্দু মুসলমান একত্রিভূত না হইলে, উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রীতি সদ্ভাব না থাকিলে দেশের বড়ই অমঙ্গল সাধিত হইবে। ... প্রত্যেক জেলায় প্রত্যেক শহরে এবং প্রত্যেক মহকুমায় কমিটি প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। দেশের যুবকগণকে এজন্য অক্লান্ত পরিশ্রমের সহিত সংগ্রাম করিতে হইবে। যুবকগণই দেশের বর্তমান আশা-ভরসার স্থল।[২২]

সুদীর্ঘ এই ভাষণদানকালে নেতাজি বাংলার প্রধান দুই সম্প্রদায়ের প্রতি সকল বিবাদ পরিহার করে সম্প্রীতিতে থাকার বিষয়ে জোর দেন। পরিশেষে তিনি দেশের যুবকদের আহ্বান জানান কংগ্রেসে যোগদানপূর্বক জনসাধারণকে বক্তৃতার দ্বারা একত্রিভূত করার জন্য। জানা যায়, রাত ৮টায় গগনবিদারী কণ্ঠে 'বন্দে মাতরম' ধ্বনির পর করোনেশন পার্কে সভাটি সমাপ্ত হয়।

নারায়ণগঞ্জ হতে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু তৃতীয়বার আসেন ১৯২৮ সালের জানুয়ারি মাসে। এসময়ে তিনি নারায়ণগঞ্জে যান। তখন ঢাকা জেলার একটি মহকুমা ছিল নারায়ণগঞ্জ। এই নারায়ণগঞ্জেই একটি সভায় যোগদানের জন্য নেতাজির আগমন ঘটে। তাঁকে আনার পেছনে যিনি মূল ভূমিকা পালন করেন তিনি হলেন নেতাজির একান্ত সহযোগী শান্তিময় গঙ্গোপাধ্যায়। শান্তিময় ছিলেন নারায়ণগঞ্জের শীতলক্ষ্যার তামাকপট্টি মহল্লার একজন বাসিন্দা। ছাত্রনেতা হিসেবে তাঁর বিশেষ পরিচিতি ছিল এই এলাকায়, আর ছাত্রজীবনেই তিনি বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের সদস্য হিসেবে যুক্ত হন। পরবর্তী সময়ে নেতাজির বিশ্বস্ত সহচর হিসেবে সিক্রেট সার্ভিসের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। নেতাজির নির্দেশনায় শান্তিময় পেশোয়ার ও কাবুল থেকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে বিশেষ অবদান রাখেন। শান্তিময় বাবুর উৎসাহ ও উদ্যোগে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ১৯২৮ সালের ২১ জানুয়ারি একটি সমাবেশে বক্তৃতা দেন।[২৩]

সাংগঠনিক কাজের জন্য নেতাজি কয়েকবার নারায়ণগঞ্জ সফর করেন। এ অঞ্চলের মানুষের স্মৃতিতে তা চিরস্মরণীয়। দ্বিতীয়বার নেতাজি নারায়ণগঞ্জ আসেন ১৯৩১ সালের ৭ নভেম্বর। সেদিন নির্যাতিত ঢাকাবাসীর সাথে একাত্মতা প্রকাশে নেতাজি ছুটে এসেছিলেন। নেতাজি যেন ঢাকা আসতে না পারেন সেজন্য ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ নানা ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। কিন্তু ব্রিটিশদের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে নেতাজি ঠিকই চলে এলেন। উল্লেখ্য, ১৯৩১ সালের অক্টোবরে পূর্ববঙ্গের বিপ্লবীরা ঢাকা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর এলজি ডুর্নোকে গুলি করে হত্যা করে। এই হত্যাকাণ্ডের সাথে দেশপ্রেমী দুই বিপ্লবী সরোজ গুহ ও রমেন ভৌমিকের নাম উঠে আসে। ব্রিটিশ পুলিশ এই দুই বিপ্লবীকে ধরার জন্য নানা পুরস্কারের কথা ঘোষণা করে এবং বিভিন্ন অপকৌশল প্রয়োগ করে। এসব সত্ত্বেও বিপ্লবীদের ধরা সম্ভবপর হয়নি। ব্যর্থ হয়ে ক্ষুব্ধ পুলিশ ঢাকাবাসীর উপর প্রবল আক্রোশে নানা ধরনের নির্যাতন শুরু করে। ঢাকার নিরীহ মানুষের উপর নির্যাতনের খবর

নেতাজির কানে পৌঁছালে তিনি খুব উদগ্রীব হয়ে ওঠেন। গান্ধী, নেহেরু, জিন্নাহ প্রমুখ যখন এই অত্যাচারের সময় নিশ্চুপ অবস্থানে তখন বীরদর্পে ঢাকায় এসে উপস্থিত হন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু।

এর আগে নেতাজির ঢাকা প্রবেশ বাধাগ্রস্ত করতে ব্রিটিশ প্রশাসন ঢাকাতে বিশেষ নজরদারি শুরু করে। কিন্তু এসব বাধা বিপত্তিকে তোয়াক্কা না করার নেশা যাঁর মজ্জাগত তাঁকে রুখিবে সাধ্য কার? কলকাতা হতে রওয়ানা হয়ে নেতাজি স্টিমারযোগে নারারণগঞ্জে আসেন। তাঁর আগমনের সংবাদে ঢাকা শহরে ব্যাপক সাড়া পড়ে গিয়েছিল। হাজার হাজার জনতা এসে জমায়েত হলো নারায়ণগঞ্জ স্টিমারঘাটে। ঢাকায় প্রবেশের ক্ষেত্রে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের দেয়া নতুন নিষেধাজ্ঞার কথা নেতাজি নারায়ণগঞ্জ স্টিমারেই শোনেন। এরপরও অকুতোভয় নেতাজি স্টিমার থেকে নামেন। এরপরই ব্রিটিশ পুলিশ তাঁকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। নেতাজির আটক হবার খবর সে সময়কার *আনন্দবাজার পত্রিকা*'য় ছাপা হয়। 'সুভাষচন্দ্র বসু গ্রেপ্তার'-এই শিরোনামে লেখা হয়,

> শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুকে নারায়ণগঞ্জে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত জে. সি. গুপ্ত ও তদন্ত কমিটির অন্যান্য সভ্যগণ ঢাকা রওনা হইয়াছেন। অদ্য অপরাহ্নকালে কলিকাতার স্টীমার নারায়ণগঞ্জে পৌঁছিলে ফৌজদারী কার্যবিধির ১৪৪ ধারা অনুসারে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুকে ঢাকা জেলার মধ্যে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিয়া একটি নোটিশ জারি করা হয়। মিঃ এল. জি. ডুর্নোর প্রাণনাশের চেষ্টার ফলে গ্রেপ্তার প্রভৃতির জন্য ঢাকায় যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে তৎসম্পর্কে শ্রীযুক্ত বসু ঢাকায় যাইতেছিলেন এবং একখানা স্টিমারযোগে নেতাজিকে চাঁদপুরে পুলিশ নিয়ে যায়।[২৪]

সেদিন আটক সুভাষচন্দ্র বসুকে নারায়ণগঞ্জ থানায় বসিয়ে পুলিশ বারবার জানতে চায়, তিনি কলকাতায় ফিরে যাবেন কিনা। অনড় নেতাজি সাফ জানিয়ে দেন তিনি নির্যাতিত ঢাকাবাসীর সাথে দেখা করতে ঢাকা যাবেনই। তখন কয়েক ঘণ্টা পরই তাঁকে নারায়ণগঞ্জ হতে চাঁদপুর পাঠিয়ে দেয়া হয়। কিন্তু অনড় সুভাষচন্দ্র চাঁদপুর থেকে রাতের ট্রেনে আখাউড়া এবং ভৈরব হয়ে ঢাকার পথে যাত্রা করেন। কিন্তু ঢাকার আগে তেজগাঁও রেলস্টেশনে তাঁকে আবার আটক করা হয়। ঢাকার মহকুমা হাকিম নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে আবারও ফিরে যেতে বলেন। কিন্তু নেতাজি ফিরে যাবেন না বলে পুনরায় জানান। এতে করে ব্রিটিশ হাকিমের আক্রোশ বেড়ে যায়। তারা নেতাজিকে বারবার হুশিয়ার করে বলেন যে, ঢাকায় আপনি কখনোই যেতে পারবেন না। তা আপনি যতবার যতো চেষ্টাই করুন প্রতিবারই ব্যর্থ হবেন। এরচেয়ে বরং আপনাকে যে শর্তগুলোর মাধ্যমে জামিন দিতে চাওয়া হচ্ছে, সেই শর্তগুলো মেনে এখনই এই জেলা ত্যাগ করুন। পুনরায় মামলার শুনানির দিন নেতাজিকে আসতে বলা হয়। নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু তাদের এই শর্ত শুনে তাচ্ছিল্যের হাসি দিয়ে বলেন, এই শর্ত আমি মানি না ও এই অযৌক্তিক শর্তের জামিন

আমি চাই না। এরপর নেতাজিকে আটকাবস্থায় পুলিশের মোটর গাড়ি যোগে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে (ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার) পাঠানো হয়।

প্রথমবারের মতো ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে নেতাজির পর্দাপণ যেন নিপীড়িত জনগণের বুকে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল। ভারতবাসীর কঠোর আন্দোলনের মুখে মাত্র কয়েকদিনের মধ্যে নেতাজিকে জেল থেকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয় ব্রিটিশ সরকার। জেল থেকে মুক্তি পেয়ে তিনি সরাসরি চলে যান সেইসব অত্যাচারিত, নিপীড়িত ও আঘাতে জর্জরিত অসহায় ঢাকাবাসীর কাছে। ১৯৩১ সালের ২৮শে অক্টোবর যেসব বাড়িতে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ হানা দিয়েছিল, তার প্রায় সবগুলো বাড়িই নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু পরিদর্শন করেন এবং নির্যাতিত মানুষের সাথে আলাপ করেন।[২৫] নিপীড়িত ঢাকাবাসী স্বচক্ষে দেখে অনুধাবন করলেন নেতাজির আদর্শ। একজন প্রকৃত মানুষ কতোটা সাহসী হলে নিজের লক্ষ্যে পৌঁছতে এতোটা কষ্ট মাথা পেতে নেন। সেদিনের এই ঘটনায় নেতাজি সমস্ত পূর্ববঙ্গ জুড়ে নন্দিত ও বন্দিত হয়ে ওঠেন।

শেষ ঢাকা সফর

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু শেষ ও পঞ্চমবারের মতো ঢাকা সফর করেন ১৯৩৯ সালে। ১৯৩৮ ও ১৯৩৯ সালে পরপর দুইবার সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের সভাপতি হন। কিন্তু ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন প্রশ্নে গান্ধী ও নেহরুর সাথে সহমত পোষণ করতে না পারায় ১৯৩৯ সালে তিনি কংগ্রেসের সভাপতি পদ ত্যাগ করেন এবং নতুন রাজনৈতিক প্লাটফর্ম তৈরির কাজে মনোনিবেশ করেন। একাজে তিনি প্রথমেই সফর করেন ঢাকা। ঢাকার সাথে নেতাজির ছিল প্রাণের সংযোগ। ঢাকাবাসীও তাঁকে গ্রহণ করেন হৃদয় উৎসারিত করে। শেষবারের এই ঢাকা সফরে নেতাজি ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে বিপুল সংবর্ধনা পান। এসময়ে তিনি ঢাকার করোনেশন পার্কে বক্তৃতা প্রদানসহ পরিদর্শন করেন ঢাকার নানা স্থান।

এরপর হাজার হাজার জনতা একটি শোভাযাত্রা করে ফুল দিয়ে সাজানো তোরণের ভেতর দিয়ে নেতাজিকে প্রফুল্লকুমার ব্যানার্জির বাড়িতে নিয়ে যায়। জানা যায়, কলকাতা হতে আসার পথে নেতাজিকে লৌহজং ও মুন্সীগঞ্জেও বিশেষভাবে সংবর্ধিত করা হয়। সবশেষে জীতেন্দ্রনাথ কুশারীর সভাপতিত্বে নারায়ণগঞ্জ স্কুল প্রাঙ্গণে একটি বিরাট জনসভা হয়। এই জনসভার মধ্যমণি ছিলেন নেতাজি। জনসভায় ১৯টি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হতে নেতাজিকে অভিনন্দন জানানো হয়। অভিনন্দন পর্ব সমাপ্তের পর সুভাষচন্দ্রের হাতে ২০১ টাকার একটি তোড়া শুভেচ্ছাস্বরূপ তুলে দেয়া হয়। অতঃপর নেতাজি তাঁর ভাষণ প্রদান করেন। সেদিন সমবেত জনতা ও তাদের শোভাযাত্রার বর্ণনা দিতে গিয়ে ঢাকা হতে প্রকাশিত *ঢাকা প্রকাশ* পত্রিকায় লেখা হয়,

> একমাত্র জন্মাষ্টমীর মিছিল ব্যতীত এরূপ সুদীর্ঘ শোভাযাত্রা ও রাস্তায় দর্শক সমাবেশ ঢাকায় আর কখনও ঘটে না, এ কথা নিঃসন্দেহেই বলা চলে। রাস্তার জনতা ভেদ করিয়া সুভাষচন্দ্রসহ শোভাযাত্রার করোনেশন পার্কে পৌঁছিতে প্রায় ১ ঘণ্টার অধিক

> সময় লাগে। সভাস্থলে এত বেশী লোক সমাগম হইয়াছিল যে, হাজার হাজার লোক স্থানাভাবে ফিরিয়ে যাইতে বাধ্য হয়। বিগত ১৯২৯ সালে মহাত্মা গান্ধী যখন ঢাকায় আগমন করিয়াছিলেন, সে সময়ের জনতার সহিত এই সভার জনতার তুলনা চলে।[২৬]

উপসংহার

স্বাধীনতা সংগ্রামী, বিপ্লবী সুভাষচন্দ্র বা সুভাষচন্দ্র বসু বলা হলেও কেমন যেন অসম্পূর্ণতা পরিগণিত হয়। মনে হয়– কী যেন বাদ রয়ে গেল। কিন্তু যখন নেতাজি শব্দটি নামের আগে যুক্ত করে দেয়া হয় তখন তা পূর্ণতা পায়। সত্যিকারই জনমানুষের দেয়া, বিপ্লবী সহযোদ্ধাদের দেয়া– সম্মানসূচক সম্বোধন 'নেতাজি' বাদ পড়লে এমনটা বোধ হওয়াই স্বাভাবিক।

ক্ষণজন্মা পুরুষ নেতাজি ছিলেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মুক্তি সংগ্রামের অগ্রদূত। আজও তাঁর নাম উচ্চারণের সাথে সাথে সর্বত্র এক অত্যাশ্চর্য আবেশের সৃষ্টি হয়। নেতাজি এখনও এ অঞ্চলের প্রতিটি মানুষের স্মৃতিমানসে চিত্রিত এক অবিস্মরণীয় নায়ক।

'নেতাজি' তিন অক্ষরের এই পদবীটা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মসনদ কাঁপিয়ে দিয়েছিল। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ার সময় আইসিএম পরীক্ষায় মেধাতালিকায় চতুর্থ স্থান লাভ করেও ইংরেজ প্রশাসনের চাকরি করবেন না বলে নিয়োগপত্র পাওয়ার পরই পদত্যাগ করেছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু। ফিরে আসেন জন্মভূমিতে। যোগ দেন স্বাধীনতা সংগ্রামে। তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রাম পেয়েছিল এক নবচেতনা। সেই স্বাধীনতা সংগ্রামের ঢেউ আছড়ে পড়েছিল পূর্ববঙ্গ তথা আজকের বাংলাদেশের বুকেও। সেই সশস্ত্র সংগ্রামে অংশ নিয়েছে হাজার হাজার বিপ্লবী।

একটি বিষয় আমাদের সুস্পষ্টভাবে মনে রাখা প্রয়োজন যে, নেতাজির রাজনৈতিক ঐতিহ্য ছিল বিপ্লবী আদর্শের ঐতিহ্য, আন্দোলনের ঐতিহ্য, সন্ত্রাসবাদের ঐতিহ্য নয়। তাঁর ঐতিহ্য উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ঐতিহ্য। আরও বলা প্রয়োজন তাঁর এই ঐতিহ্য ও বিপ্লবী আদর্শ শুধু বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত ছিল না, এই উপমহাদেশের রাজনৈতিক ঐক্য, সমাজ সংহতি, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও দেশের বৃহত্তর উন্নয়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে ছিল তাঁর সুচিন্তিত রূপরেখা ও দিকনির্দেশনা। সেসময়ে ভারতের বিভিন্ন স্থানে এবং বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে যেসব সভা সমাবেশ হয়েছে তাতে উচ্চারিত হয়েছে নেতাজির বাণী, প্রদর্শিত হয়েছে ছবি।[২৭] শুধু তাই নয়, মুক্তিযুদ্ধের সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বাংলাদেশের অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে চলে যাওয়া শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবীদের অনেকেই আশ্রয় নেয় নেতাজির পারিবারিক ভবন কলকাতার ৩৮/২ এলগিন রোডে। সেখান হতেই বুদ্ধিজীবীগণ পরিকল্পনা করেন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে তাঁদের নিজস্ব সংগ্রামের রূপরেখা।

পরিশেষে ইতিহাসের ছাত্র হিসেবে বলতে চাই, নেতাজি যথার্থই ছিলেন উপনিবেশ উত্তর বাংলা ও আধুনিককাল-উত্তর দক্ষিণ এশীয় উপমহাদেশের সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতিপূর্ণ 'সুশীল সমাজের' পথিকৃৎ, অগ্রপথিক। তাই নেতাজিকে কেবল কালজয়ী ব্যক্তিত্ব বললে কম বলা হবে। তাঁর চিন্তাধারা ছিল দিগন্ত বিস্তৃত। তিনি উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ বিদ্বেষী ছিলেন বটে, কিন্তু ইউরোপ, শ্বেতাঙ্গ বা ব্রিটিশবিদ্বেষী ছিলেন না। তিনি পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে উপনিবেশবাদের শিকার এশীয় জাতিসমূহের একাত্মতা কামনা করেছিলেন। জাপানকে কেন্দ্র করে গড়ে তুলেছিলেন মৈত্রী সম্পর্ক। এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে জাপান এখন অন্যতম বৃহৎ অর্থনৈতিক শক্তি। আজ এশিয়ার জনমানুষের বৃহৎ অংশের মধ্যে প্রতিসাম্য ভিত্তিক সম্পর্ক গড়ে তোলার অভিলাষ লক্ষণীয়। এই নতুন শতাব্দীতে বিশ্বজুড়ে দেখা দিয়েছে এক নতুন চেতনা। সেই চেতনা হচ্ছে শান্তি ও সম্প্রীতির চেতনা, মানুষের মানবিক অধিকারের চেতনা। এই চেতনার জাগরণ হচ্ছে টেকসই উন্নয়ন, অগ্রগতি ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির দাবি নিয়ে। নেতাজির কাঙ্ক্ষিত মানবিক প্রতিসাম্যভিত্তিক রূপরেখার সঙ্গে এসব যথেষ্ট সামঞ্জস্যপূর্ণ।

টিকা ও তথ্যসূত্র

১ আবুল কালাম, *সুভাষ বসুর রণনীতি ও কূটনীতি*, (ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ২০০৭), ০২।

২ পূর্বোক্ত, ৩৫

৩ শাহজাহান সাজু, *নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু*, (ঢাকা, কথাপ্রকাশ, ২০১৮), ১৩।

৪ নন্দ মুখোপাধ্যায়, *বিবেকানন্দের আলোয় সুভাষ*, (কলকাতা, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, ২০১৮), ১০।

৫ আবুল কালাম, *প্রাগুক্ত*, ১১-১২

৬ সুপর্ণা ভট্টাচার্য, *সুভাষচন্দ্র*, (ঢাকা, নালন্দা, ২০১৫), ৪২।

৭ কালাম ফয়েজী, *মহানায়ক নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু*, (ঢাকা, কাকলী প্রকাশনী, ২০১৯), ৮২।

৮ Sugate Bose, *His Mayjesty's opponent Subhas Chandra Bose*, (New Delhi, Penguine Books India Pvt. Ltd., 2011), ২১৩.

৯ আনিসুজ্জামান (সম্পা.), *মুক্তির সংগ্রাম*, (ঢাকা, চন্দ্রবতী একাডেমি, ২০১২), ১৩৩

১০ কালাম ফয়েজী, *প্রাগুক্ত*, ৪৫।

১১ *The Daily Star*, 23 January 2022.

১২ *পূর্বোক্ত*।

১৩ ড. রতনলাল চক্রবর্তী, *বাংলাদেশের দলিল ও সংবাদপত্রে নেতাজী সুভাষ*, (কলকাতা, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০২১), ২৪-২৬

১৪ সৈয়দ আবুল মকসুদ, *সলিমুল্লাহ মুসলিম হল*, (ঢাকা, প্রথমা, ২০১৯), ১৪৫।

১৫ *পূর্বোক্ত*।

১৬ আবুল কালাম, *রেখাচিত্র* , (ঢাকা : বাতিঘর, ২০২০), ২১৬-২১৭।

১৭ *ঢাকা প্রকাশ*, ১৫ জানুয়ারি ১৯২৮।

১৮ *ঢাকা প্রকাশ*, ৮ জুলাই ১৯২৮।

১৯ *পূর্বোক্ত*।

২০ *ঢাকা প্রকাশ*, ২৮ মে ১৯২৮।

২১ *পূর্বোক্ত*।

২২ *ঢাকা প্রকাশ*, ২৮ মে ১৯২৮।

২৩ *The Daily Star*, 23 January 2022.

২৪ *পূর্বোক্ত*।

২৫ *নিউজ নারায়ণগঞ্জ*, ১৭ আগস্ট ২০২০।

২৬ *ঢাকা প্রকাশ*, ১১ জুন ১৯২৮।

২৭ নজরুল ইসলাম, (সম্পা.), *নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ভাষণ সংগ্রহ*, (ঢাকা, বর্তমান সময়, ১৯৯৭), প্রসঙ্গ-কথা।